# শ্রীরামকৃষ্ণসূত্র

অজয় কুমার ভট্টাচার্য

**অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর**

লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন যে, এই কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বালকভক্তদের প্রায়ই বলতেন। কথাটি আমরা কথামৃতে পাই না, তাই এই উপদেশটি মূলত ত্যাগী পার্ষদদের উদ্দেশে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু কথাগুলির ব্যাপকতর অর্থ আছে, তাই সেটি শুধু অধ্যাত্মপথের পথিকের জন্যই নয়, জাগতিক পথেও ঋদ্ধি ও সিদ্ধি লাভের সহায়ক। কথাটি গভীরতার মাত্রা অনুসারে এক-একজনের কাছে এক-একরকম সহায়তা এনে দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণের বালকভক্তেরা তাঁর পার্ষদ, যাঁরা অবতারপুরুষের সঙ্গে তাঁর কাজের সহায়তার জন্য আসেন। কিন্তু তাঁরা তখনও সে-সম্বন্ধে সচেতন নন। তাঁরা কেউ কেউ শাস্ত্র পড়ে, কেউ তাঁর ভক্তদের ভাবের উচ্ছ্বাস দেখে অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের জাগতিক চেতনা থেকে ব্রহ্মচেতনা পর্যন্ত অনায়াস যাতায়াত দেখে, ইচ্ছেমতো তার একটি বেছে নিয়ে তা লাভ করার চেষ্টা করতেন। হরিনাথ, পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ, বেদান্তবিচারে এতই ব্যস্ত থাকতেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসার সময় পেতেন না। বাবুরাম সকলের ভাবাবস্থা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে বসেছিলেন—তাঁরও যাতে ভাব হয়। নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার বিশ্বাসে মা কালীকে বলতেন পুত্তলিকা। আরও বলতেন, ঠাকুর এখনও কালীঘরে যান, জ্ঞান হলে আর যাবেন না। তাঁদের বিচিত্র ভাব-ভাবনায় আঘাত না দিয়ে লক্ষ্য স্থির করে দেওয়ার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ওই কথাটি বলতেন। কারণ তিনি জানতেন, জগৎকল্যাণে পার্ষদদের নির্দিষ্ট কাজ আছে। তাই তাঁদের একটা নির্দিষ্ট ধারায় গড়ে উঠতে হবে; সে-গড়ন শেষ হলে তাঁরা ইচ্ছেমতো আচরণ করতে পারবেন। তবে 'যা ইচ্ছে তাই কর' বাক্যাংশটি আমরা নেতিমূলক বলেই জানি। এর ইতিমূলক ভাবটি হল, যা ইচ্ছে তাই করার ক্ষমতা এবং সে-ক্ষমতা লাভ হয় অদ্বৈতবোধে স্থিত হলে।

সেযুগে গৃহকর্ত্রীদের আঁচলে সংসারের চাবি বাঁধা থাকত। সেই চাবি ছিল কর্তৃত্বের অধিকার ও তার লক্ষণ। যার আঁচলে চাবি তিনিই সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী, তিনিই সব সমস্যা মোকাবিলা করবেন। চাবির মতো যদি অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধা থাকে তো সেই চাবি দিয়ে এই জগৎসংসারের সব

*রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখক*

সমস্যার জট খোলা যায়। কারণ জগতের সব সমস্যার মূল হল আমাদের ভেদবুদ্ধি যা মায়ার প্রভাবে আমাদের সত্তার ওপর ক্রিয়া করে। সমুদ্রে অসংখ্য ঢেউ—প্রতিটি রূপে ও শক্তিতে আলাদা, কিন্তু সমুদ্র নামক উৎস থেকে যে-ক্ষণিক জীবনের সৃষ্টি তা আবার সেই সমুদ্রেই লয় হয়। তারা যদি নিজেদের আলাদা সত্তা বলে অনুভব করে, ঢেউ হিসাবে 'আমি বড় ও ছোট' এই বোধ আসে, তবে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। আমাদের ঠিক সেই অবস্থা। সত্তায় এক হয়েও আমাদের ভেদবোধের কারণ—জগৎ সৃষ্টির উপাদানই অসাম্য। ছোট-বড়র বোধ আছে বলেই এই বিচিত্র জগৎ চলছে। সাম্যভাবে স্থিত হলে তার বিলুপ্তি ঘটবে। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে সাম্যভাব লাভ করা সম্ভব সেই শান্ত, স্থির সাম্যভাবকে ছুঁয়ে। সব ঢেউ একসঙ্গে সমুদ্রে লয় হয় না, তেমনই, কেউ কেউ সেই সাম্যে স্থির হতে পারেন। তখন ''সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি/ ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ'' (গীতা ৬।২৯)—তিনি সর্বভূতে নিজেকে দেখতে পান, আবার নিজের মধ্যেও সর্বভূতকে দেখতে পান। তাঁর তখন সমদর্শিতা স্বভাবগত হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ঋষিদের জ্ঞানলাভের পর স্বেচ্ছাচার হয়ে যেত। আমরা যে-অর্থে 'স্বেচ্ছাচার' কথাটি ব্যবহার করি সে-অর্থে নয়। এই 'স্ব-ইচ্ছায়-আচার' নিজের অশুদ্ধমনের ইচ্ছায় নয়, শুদ্ধমনের ইচ্ছায়। একত্বের জ্ঞানে ভেদবুদ্ধির আচার আর হয় না, তাই সেটি আমরা বুঝতে পারি না। ঠাকুর পূজায় বসে দেখতেন সব চৈতন্যময়—মায়ের মূর্তি, বেদি, তিনি নিজে, কোশাকুশি, চৌকাঠ পর্যন্ত। বেড়াল ঢুকেছে, জ্বলজ্বল করছে চৈতন্য, তিনি ঈশ্বরবোধে তাকে ভোগের লুচি খাইয়ে দিলেন। ফুল দেবেন—মায়ের পায়ে না দিয়ে নিজের মাথায়, পায়ে যত্রতত্র চলে যাচ্ছে। পূজা উঠে গেল—স্বাভাবিক কর্মত্যাগ।

কিন্তু এই স্বেচ্ছাচারে বিশেষত্ব আছে। ঠাকুরের সামনে একঘর লোক, তিনি দেখছেন সকলের মধ্য দিয়ে সেই মা-ই উঁকি মারছেন। কিন্তু যখন দেখছেন যে তৎসত্ত্বেও তাঁদের অজ্ঞান ঘিরে আছে—'তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি'—তখন তাদের উদ্ধারের জন্য তাঁর প্রাণ ব্যাকুল। শ্রীশ্রীমাকে বললেন, ''কলকাতার লোকগুলো অন্ধকার পোকার মতো কিলবিল করছে, তুমি তাদের দেখো।'' এই 'স্বেচ্ছাচার' বা 'যা ইচ্ছে' করায় কারও ক্ষতি হওয়া সম্ভব নয়, কারণ এই ইচ্ছেতে করুণা, ভালবাসা ছাড়া কিছু থাকে না। অতএব 'যা ইচ্ছে তাই কর' মানে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ হলে যা ইচ্ছে তা করার শক্তি লাভ করতে পারবি এবং সে-ইচ্ছেতে লোকের প্রতি করুণা, তাদের জাগতিক ও পারমার্থিক কল্যাণচিন্তা ছাড়া আর কিছু জাগবে না। তার আগে পর্যন্ত সেই জ্ঞানলাভের চেষ্টার সাধনা করতে হবে, তা জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম যে-পথেই হোক।

### সত্যকথাই কলির তপস্যা

সত্যের সংজ্ঞা—যা অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ তিন কালেই এক থাকে। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'—সত্যই জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত ও ব্রহ্ম। সেই অনন্ত সত্য বা ব্রহ্ম কখনও উচ্ছিষ্ট হননি কারণ তাঁকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ঠাকুর বলছেন ব্রহ্ম অস্তিমাত্র বোধ, আবার অস্তি-নাস্তির পার। জগতের সমস্ত দ্বন্দ্বমূলক বৃত্তির বাইরে তার অনুভব। কিন্তু আমরা জগতে যে-সত্যের সম্মুখীন হই তা কি তাই? তার তো পরিবর্তন আছে। কাল যা সত্য ছিল তা আজ আর সত্য নাও থাকতে পারে। পরিবর্তনশীল জগতে ঠাকুরের ভাষায় 'বাদশাহী টাকা নবাবী আমলে চলে না।' তাই সত্যের দুটি রূপ। একটি পারমার্থিক সত্য ও অপরটি ব্যাবহারিক সত্য। পারমার্থিক সত্য কালাতীত—বয়ে চলা সময়ের পারে। ব্যাবহারিক সত্য কালাধীন, তার ওপর সময় প্রভাব ফেলে। ঠাকুর বলছেন, ''চৈতন্যদেব অবতার, তাঁরই কি

রয়েছে বল দেখি?" অর্থাৎ তাঁর প্রচারিত সত্যের কতটুকুই বা অবশিষ্ট আছে? গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সেই পুরাতন যোগই আমি তোমাকে আবার নতুন করে বলছি (৪।৩)। নতুন করে বলতে হচ্ছে কারণ সেই পুরনো যোগ যুগের বদলের সঙ্গে কার্যকারিতা হারিয়েছে। তাহলে প্রশ্ন, এই ব্যাবহারিক সত্য কতটা সত্য, আর সাধকের কাছে এই সত্যের উপযোগিতাই বা কতটুকু? সেই দৃষ্টিতে ঠাকুরের কথাটি আমাদের বুঝতে হবে।

এ-সত্য মায়ার রাজ্যে অর্থাৎ শক্তির এলাকায়, তাই এর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। পরিবর্তন অবশ্যই কারও সাপেক্ষে, অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় কারও সঙ্গে তুলনায়, নাহলে আমরা পরিবর্তন বুঝব কী করে। এই দুটির সম্পর্ক ঠাকুর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বলছেন, 'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ', অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তির মতন। অপরিবর্তনশীল ব্রহ্ম ও শক্তির পরিবর্তনশীল প্রকাশ—এ-দুটি অভেদ। যতক্ষণ আমরা শক্তির অধীনে ততক্ষণ সেই অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মের ধারণা আসে না, তাই শক্তিই আমাদের কাছে ব্রহ্মের সঙ্গে যোগসূত্র। যেমন উত্তাপ আগুনের প্রকাশ আর তাকে আশ্রয় করে আমরা ক্রমশ আগুনের কাছে পৌঁছতে পারি। উত্তাপের আলাদা সত্তা নেই, আগুনের সত্তাতেই তার সত্তা। তেমনি ব্যাবহারিক সত্যের সত্তা সেই পারমার্থিক সত্যের আধারেই স্থাপিত। বন্ধ দরজা-জানালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের রশ্মি ঘরে ঢুকে বিচিত্র সব রূপ সৃষ্টি করে, কিন্তু যেকোনও একটি রশ্মিকে অনুসরণ করলে আমরা সেই সূর্যেই পৌঁছই। তেমনই, ব্যাবহারিক সত্যকে ধরে এগোলে আমরা তার আধার সেই পারমার্থিক সত্যেই পৌঁছব। শক্তিপ্রকাশের তারতম্যে এই জগতের বৈচিত্র্য, তাই সত্যের প্রকাশেও বিচিত্র তারতম্য। এই তারতম্যের কারণেই স্বামীজী অবলীলায় বলেছেন যে, মিথ্যা বলে কিছু হয় না, আমরা নিম্নতর সত্য থেকে ক্রমশ উচ্চ, উচ্চতর হয়ে উচ্চতম সত্যের অভিমুখে চলি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, সত্য কথা কলির তপস্যা। মুখের কথা শব্দ মাত্র, যদি তার পিছনে কোনও ভাব না থাকে। আবার ভাবের সঙ্গে কথার মিল না থাকলে সেটি সত্য হলেও মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হবে। কাহিনি আছে, এক শেয়াল ব্যাধের তাড়া খেয়ে কোনও সাধকের কুটিরে লুকিয়ে পড়ল। বাইরে সাধক চোখ বুজে ধ্যান করছিলেন। শেয়াল তাঁকে ব্যাধকে কিছু বলতে বারণ করে কুটিরে আশ্রয় নিল। ব্যাধ এসে সাধককে জিজ্ঞাসা করল তিনি শেয়ালকে দেখেছেন কী না। সাধক বললেন, 'দেখিনি', বলেই ইঙ্গিতে নিজের কুটিরটি দেখিয়ে দিলেন। ব্যাধ শেয়ালকে ধরে নিয়ে গেল। সাধক সত্য বললেন কারণ তিনি চোখ বুজেছিলেন কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন না। এই সত্য বাচিক সত্য নয়। ভাবের সঙ্গে কথার মিল আনতে গেলেই অন্তরে সত্যের আসন দৃঢ় করতে হবে। ভয়ে নয়, অপরের ক্ষতি করার জন্য নয়, নাম-যশ লাভের জন্য নয়—সত্য বলতে হবে সত্যকে ভালবেসে, তাকেই আশ্রয় করে। রামভক্ত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের সত্যপালনের ঘটনা আমরা জানি যা তাঁর ইষ্ট রামচন্দ্রের সত্যপালনের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। মিথ্যা বলে অপরের সম্পত্তি দখল করার কাহিনি অনেক, কিন্তু শুধু মিথ্যা বলতে হবে বলে নিজের দেড়শো বিঘা সম্পত্তি ছেড়ে অনির্দিষ্টের পথে পা বাড়াতে সত্যের প্রতি যে-ভালবাসা লাগে তা আমরা কল্পনা করতে পারি না। সে-ভালবাসা অর্জন করতে যে-সুকঠিন তপস্যা করতে হয় তাও আমাদের কল্পনার বাইরে। কিন্তু সত্যের পথ কণ্টকাকীর্ণ, সে-পথে চলতে গেলে শরীর-মন ক্ষতবিক্ষত হবেই। ''হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং/ তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে'' (ঈশোপনিষদ, ১৫)—স্বর্ণময় পাত্র দিয়ে সত্যের মুখ ঢাকা আছে, হে পালনকর্তা আদিত্য,

তুমি তা অপসারিত করে সত্যধর্মপরায়ণ আমাকে সত্যের মুখ দর্শন করাও। এই প্রার্থনার যোগ্যতা লাভ করতে সত্যকে আশ্রয় করতে হবে। আর সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করলে তবেই মুখে সত্য বই আর কিছু বেরোবে না। ঠাকুর মাস্টারমশাইকে শুধু ওইটুকুই বলেননি, বলেছিলেন, ''সত্যেতে থাকবে, তাহলেই ঈশ্বরলাভ হবে।''

স্বামী বিশ্ববেদানন্দজীর বলা একটি গল্প মনে পড়ছে। এক রাজা তাঁর প্রজাদের সুবিধার জন্য একটি হাট বসালেন। হাট জমে উঠতে সময় লাগে তাই ঘোষণা করলেন, প্রথম একমাস হাটে অবিক্রীত সব জিনিস তিনি কিনে নেবেন। হাট শুরু হল। একদিন এক দেহোপজীবিনী হাজির। সন্ধ্যায় যখন রাজকর্মচারীরা পড়ে থাকা সব জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছে তখন সে তাদের বলল যে, তাকেও রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে হবে কারণ সেদিন তাকে কেউ ডাকেনি, সে অবিক্রীত। কর্মচারীরা শুনতে রাজি নয় কিন্তু সেও ছাড়বে না। শেষে রাজার কাছে খবর গেল, তিনি অনুমতি দিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় রাজা মন্দিরে আহ্নিকে বসেছেন, এমন সময় ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ শুনে দেখছেন যে, মহামূল্য রত্নালঙ্কার পরিহিতা এক সুন্দরী দেবীমূর্তি চলে যাচ্ছেন। ''তুমি কে মা''—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, ''আমি রাজলক্ষ্মী। যে-প্রাসাদে রাজা এক পতিতা নারীকে স্থান দিয়ে কলুষিত করেন সেখানে আমি কী করে থাকব, তাই চললাম।'' রাজা একটু ভেবে বললেন, ''বেশ, তবে এসো।'' একটু পরেই আর একজন শুভ্রবেশিনী দেবীকে যেতে দেখলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন তিনি রাজবিদ্যা, কিন্তু যেখানে রাজলক্ষ্মী থাকেন না সেখানে তাঁরও থাকা চলে না। রাজা দ্বিরুক্তি না করে বললেন, ''এসো।'' একে একে রাজশৌর্য, রাজধর্ম সবাই চলে গেলেন, রাজা কাউকে আটকালেন না। শেষে এক প্রাচীন শ্বেতবসন পরিহিত শ্বেতমূর্তি চলে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, ''তুমি কে?'' তিনি বললেন, ''আমি রাজসত্য। যেখানে রাজার লক্ষ্মী, বিদ্যা, শৌর্য, ধর্ম সব চলে গেছে সেখানে আমি কী করব, তাই চলে যাচ্ছি।'' রাজা শুনেই আদেশের স্বরে বললেন, ''তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমি কি তোমায় ছেড়েছি? তোমায় ছাড়িনি বলেই তো এরা সব চলে গেছে। যাও ভেতরে যাও।'' সত্য দেখলেন রাজার কথা সত্য, তাই তিনি আর যেতে পারলেন না। খানিক পরে রাজা দেখলেন যাঁরা চলে গিয়েছিলেন তাঁরা সবাই একে একে ফিরে আসছেন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, ''কী হল, ফিরে এলে যে?'' তাঁরা বললেন, ''সত্যকে নিয়েই তো আমাদের অবস্থান, তিনি সঙ্গে না থাকলে আমরা কী করে থাকব, তাই ফিরে আসতে হল।''

সত্য থাকলে সব থাকে, না থাকলে কিছুই থাকে না।

ব্যাসদেব ভাগবতে ঈশ্বরলীলা বর্ণনা করেছেন। প্রথম শ্লোকের শেষ চরণে বলছেন, ''ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি''—এই লীলা, যা আমাদের মোহ দূর করে, সেই লীলার মাধ্যমেই আমরা পরম সত্যের ধ্যান করি। ঈশ্বরের লীলা, যা ব্যাবহারিক সত্য, তার মননের দ্বারা পারমার্থিক সত্যেরই ধ্যান হয়। শুধু প্রথমেই নয় অন্তিমেও পুনরাবৃত্তি হয়েছে কথাটির—''তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমলং সত্যং পরং ধীমহি''—সেই শুদ্ধ, নির্মল, শোকহারী অমল লীলা আস্বাদনের মাধ্যমে আমরা সেই পরম সত্যেরই ধ্যান করি। সেই পারমার্থিক সত্যই জগতে প্রতিবিম্বিত হয়ে ব্যাবহারিক সত্যরূপে প্রতিভাত হচ্ছে। তাই সত্যের এত কদর। এখন রামকৃষ্ণলীলার যুগ। তাঁর স্পর্শপূত স্থান, লীলার ঘটনাবলি এখনও সজীব। সত্যস্বরূপ তাঁর লীলার ধ্যানে আমরা কায়িক-বাচিক-মানসিক সত্যকে লাভ করব তাতে সন্দেহ নেই। *ক্রমশ*